Vol. 34 | No. 3 | 1991

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে বালক

Volume	34
Issue	3
Year	1991
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সৈয়দ আজিজুল হক
Published online	June 1, 1991
DOI	10.62328/sp.v34i3.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v34i3.5
Pages	1-18
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে বালক

সৈয়দ আজিজুল হক

রবীন্দ্রসাহিত্যে মানবজীবন-রহস্যের নিগূঢ় সত্যসমূহ উন্মোচিত হয়েছে নানা শৈল্পিক অনুভবে। উপনিষদ-পরিস্রুত রবীন্দ্রভাবনার জারকরসে সিক্ত হয়ে জীবনসত্যসমূহ হয়ে উঠেছে কখনও দর্শনমণ্ডিত, তাৎপর্যপূর্ণ, আবার কখনও গভীরতর অনুভববেদ্য। জীবন-যে আনন্দময়, জীবনের সাহচর্যেই-যে জীবনের সত্যিকার স্ফূর্তিলাভ সম্ভব, কিংবা মানুষের শ্রম যতটুকু মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত ততটুকুই সে মনুষ্যপ্রকৃতির—এ-জীবনবোধ রবীন্দ্রনাথের শিল্পচেতনাকে বারবার স্পর্শ করে গেছে। রবীন্দ্রনাথ জীবন ও জগৎকে এক অবিচ্ছিন্ন সত্তা হিসেবে কল্পনা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, জড়পৃথিবীর নিত্যস্থিতির ওপর নিত্যগতির এক লীলাই বিশ্বজগৎকে সম্পূর্ণতা দিয়েছে। পৃথিবীর ধাতুপাথরের অচল ভিত্তির সর্বোচ্চ তলায় নিরন্তর চলছে এই গতির প্রবাহ, চলছে প্রাণ যৌবন ও সৌন্দর্যের প্রবাহ।[১] স্বার্থ ও পরমার্থের সামঞ্জস্যসাধনের মধ্য দিয়ে যেমন মানবজীবনের কর্মচাঞ্চল্য সামগ্রিক ও সার্থক হয়ে ওঠে, তেমনি প্রকৃতিজগতের মধ্যেও রয়েছে বন্ধন ও মুক্তির এক বিস্ময়কর সমন্বয়প্রয়াস। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, সমাজনীতি রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতির ভেতর দিয়ে মানুষের উন্নতির ইতিহাস হচ্ছে এই সামঞ্জস্যসাধনেরই ইতিহাস।[২] তিনি মানুষের জীবনের নানা পর্বের মধ্যেও এই ঐক্যসূত্রের সন্ধান করেছেন। তাঁর মতে, ''শৈশব যৌবন বার্ধক্য সমস্তই অপূর্বভাবে সম্মিলিত।'' এ ঐক্য বা সম্মিলন হচ্ছে সুন্দরের ঐক্য সুন্দরের সম্মিলন।[৩] রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বাল্যজীবন যখন ইন্দ্রিয়বোধের বাইরের ক্ষেত্র তখনো সে সুন্দর, যৌবন যখন ভাববোধের মানসক্ষেত্র তখনো সে সুন্দর, প্রৌঢ় যখন বাহির ও অন্তরের সম্মিলনক্ষেত্র তখনও সে সুন্দর এবং বৃদ্ধ যখন বাহির ও অন্তরের অতীত তখনো সে

সুন্দর।[৪] শিল্পী রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে তাই সুন্দরের সাধনাই মানবাত্মার মুক্তির সাধনা।

১

বিশ্বচরাচরের অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্যচেতনার সঙ্গে মানবমনস্তত্ত্ব-সম্পর্কিত রবীন্দ্র-অনুভব একত্রিত হয়ে তাঁর রচনাকে বিশেষ তাৎপর্য দান করেছে। উপনিষদীয় দর্শন অনুযায়ী, বিশ্বগতের সমগ্র সৃষ্টির মর্মমূলে যে-ঐক্যসূত্র রয়েছে, সেটাই প্রকৃতির অন্তর্বেদনার সঙ্গে মানবমনকে যুক্ত করেছে নিবিড়ভাবে। ভূমণ্ডলের সৃষ্টিরহস্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথের এই সমগ্রতাস্পন্দী অন্তর্দৃষ্টিই তাঁকে বালকচরিত্র সম্পর্কে এক নবতর বোধে উন্নীত করে। ফলে রবীন্দ্রনাথের গল্পে নাটকে উপন্যাসে বালকচরিত্র এক বিশেষ দার্শনিক উপলব্ধির বাহন হিসেবে অস্তিত্ববান। তাঁর *ছুটি* (১২৯৯), *আপদ* (১৩০১), *দিদি* (১৩০১), *অতিথি* (১৩০২), *বলাই* (১৩৩৫) প্রভৃতি গল্পে; *বিসর্জন* (১২৯৭), *ডাকঘর* (১৩১৮), *ফাল্গুনী* (১৩২২), *রক্তকরবী* (১৩৩৩), ইত্যাদি নাটকে; এবং *রাজর্ষি* (১২৯৩), *চোখের বালি* (১৩০৯), *নৌকাডুবি* (১৩১৩), *ঘরে-বাইরে* (১৩২৩), *যোগাযোগ* (১৩৩৬) প্রভৃতি উপন্যাসে বিভিন্ন বয়সের বিচিত্র প্রকৃতির বালকচরিত্রের আবির্ভাব ঘটেছে। আদি-প্রাণের প্রবাহকে রক্তে ধারণ করে বালক হয়ে উঠেছে কখনও সুন্দর নির্মল বীর দেবতা, কখনও বন্ধন-মুক্তির প্রতীক; নারীজীবনে মাতৃত্ববোধ জাগ্রতকারী চিরনবীন ও চিরপ্রবীণ এই বালকসত্তা কখনও অসহায় হৃদয়ে সত্যোপলব্ধির সহায়, কখনও নৈঃসঙ্গ্য ও বিপর্যস্ত জীবনে প্রশান্তির উৎস। শাশ্বত জীবনধারায় প্রবাহিত বিশ্বপ্রাণের বাণী বালকমনে প্রকৃতপক্ষে সজীবতা লাভ করে—বালক-সম্পর্কিত এই রবীন্দ্রদর্শনের প্রকাশ ঘটেছে তাঁর *বলাই* গল্পেঃ

এই ছেলের আসল বয়স সেই কোটি বৎসর আগেকার দিনে, যেদিন সমুদ্রের গর্ভ থেকে নতুন-জাগা পঙ্কস্তরের মধ্যে পৃথিবীর ভাবী অরণ্য আপনার জন্মের প্রথম ক্রন্দন উঠিয়েছে —সেদিন পশু নেই, পাখি নেই জীবনের কলরব নেই, চার দিকে পাথর আর পাঁক আর জল। কালের পথে সমস্ত জীবের অগ্রগামী গাছ, সূর্যের দিকে জোড় হাত তুলে বলেছে, 'আমি থাকব, আমি বাঁচব, আমি চিরপথিক, মৃত্যুর পর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অন্তহীন প্রাণের বিকাশতীর্থে যাত্রা করব রৌদ্রে-বাদলে, দিনে-রাত্রে'। গাছের সেই রব আজও উঠছে বনে বনে, পর্বতে প্রান্তরে, তাদেরই শাখায় পত্রে ধরণীর প্রাণ বলে বলে উঠছে, 'আমি থাকব, আমি থাকব।' বিশ্বপ্রাণের মূক ধাত্রী এই গাছ নিরবচ্ছিন্ন কাল ধরে দ্যুলোককে দোহন করে; পৃথিবীর অমৃতভাণ্ডারের জন্যে প্রাণের তেজ, প্রাণের রস, প্রাণের লাবণ্য সঞ্চয় করে; আর উৎকণ্ঠিত প্রাণের বাণীকে অহর্নিশি আকাশে উচ্ছ্বসিত করে তোলে, 'আমি থাকব। সেই

বিশ্বপ্রাণের বাণী কেমন-একরকম করে আপনার রক্তের মধ্যে শুনতে পেয়েছিল ওই বলাই।[৫]

উদ্ভিদের জন্মের মধ্য দিয়ে বিশ্বে আদি প্রাণেরও উদ্ভব ঘটেছিল—এ শুধু রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক প্রত্যয় নয়, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারেও সত্য প্রমাণিত। শিল্পী রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, সেই আদি প্রাণ জন্মের পর থেকেই তার অস্তিত্বকে ঘোষণা করে চলেছে। জন্ম-জন্মান্তরের ভেতর দিয়ে চিরপথিক আদিজীব উদ্ভিদ তার অন্তহীন প্রাণের ঘোষণাকে করেছে সার্থক। বালক-বিষয়ক রবীন্দ্র-উপলব্ধির যে-উদ্ভাসন ঘটেছে *ফাল্গুনী* নাটকে, তার বক্তব্যও অনুরূপ: ''শিশু জন্মাবামাত্র চেঁচিয়ে ওঠে, সেই কান্নার মানে জানেন মহারাজ? শিশু হঠাৎ শুনতে পায় জল-স্থল-আকাশ তাকে চার দিক থেকে ব'লে উঠেছে--''আমি আছি।''—তারই উত্তরে ঐ প্রাণটুকু সাড়া পেয়ে ব'লে ওঠে—''আমি আছি।'' আমার রচনা সেই সদ্যোজাত শিশুর কান্না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ডাকের উত্তরে প্রাণের সাড়া।''[৬] রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস, বিশ্বপ্রাণের এই বাণী সকল বালকরক্তে নিরন্তর বেগে স্পন্দিত হচ্ছে। সে-কারণে শিশু যেমন চিরনবীন তেমনি চিরপ্রবীণ। জন্ম-জন্মান্তরের পথিক আত্মাকে ধারণ করে সে-ও চিরনবীনতা ও চিরপ্রবীণতার উত্তরাধিকার লাভ করেছে। অভিজ্ঞতার ভারে ন্যুব্জ বৃদ্ধমন পরিবর্তনের দোলায় দোলায়িত— সেই পরিবর্তিত প্রাচীনতাই অনন্তকাল ধরে শিশুর মধ্য দিয়ে নবীন হয়ে প্রস্ফুটিত হচ্ছে রবীন্দ্রভাবনার এ প্রান্তটি উন্মোচিত হয়েছে *ছেলেভুলানো ছড়া* (১৩০১) প্রবন্ধে:

ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর-কিছুই নাই। দেশ কাল শিক্ষা প্রথা অনুসারে বয়স্ক মানবের কত নূতন পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু শিশু সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে। সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারংবার মানবের ঘরে শিশুমূর্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে, অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন, যেমন সুকুমার, যেমন মূঢ়, যেমন মধুর ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে। এই নবীন চিরত্বের কারণ এই যে, শিশু প্রকৃতির সৃজন। কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহুলপরিমাণে মানুষের নিজকৃত রচনা।...[৭]

সবুজের অভিযান (১৩২১) কবিতায় রবীন্দ্রনাথের এ-উচ্চারণেরই প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করা যায়: 'চিরযুবা তুই যে চিরজীবী,/ জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে/ প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি।/ সবুজ নেশায় ভোর করেছিস ধরা,/ ঝড়ের মেঘে তোরই তড়িৎ ভরা,/ বসন্তেরে পরাস আকুল-করা/ আপন গলার বকুল-মাল্যগাছা,/ আয় রে অমর, আয় রে আমার কাঁচা।'[৮] *ফাল্গুনী* নাটকে বালকদল খোঁজ করেছে এক বৃদ্ধকে। মান্ধাতার আমলের সেই বুড়ো। কোন্ গুহার মধ্যে তলিয়ে থাকে, মরবার নাম করে না। যার সঙ্গে দেখা হয় সবাই তার কথা বলে। পুঁথিতেও তার কথা লেখা আছে। অথচ তন্নতন্ন করে খুঁজেও তাকে পেলনা বালকদল। নাটকটি প্রতীকী।

বৃদ্ধকে–যে পাওয়া গেল না, তার মধ্য দিয়ে একটি তত্ত্বকথা ব্যক্ত হয়েছে। বৃদ্ধকে খুঁজতে গিয়ে বালকদলের সর্দার নিজেই বৃদ্ধের রূপ ধরে ফিরে এল। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো।

বুড়ো কোথায়।
সর্দার। কোথাও তো নেই।
কোথাও না?
সর্দার। না।
তবে সে কী।
সর্দার। সে স্বপ্ন।
চন্দ্রহাস। তবে তুমিই চিরকালের?
সর্দার। হাঁ।
চন্দ্রহাস। আর আমরাই চিরকালের?
সর্দার। হাঁ।
পিছন থেকে যারা তোমাকে দেখলে তারা যে তোমাকে কত
লোকে কত রকম মনে করলে তার ঠিক নেই।
সেই ধুলোর ভিতর থেকে আমরা তো তোমাকে চিনতে পারি নি।
তখন তোমাকে হঠাৎ বুড়ো বলে মনে হল।
তার পর গুহার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলে। এখন মনে হচ্ছে
যেন তুমি বালক। যেন তোমাকে এই প্রথম দেখলুম।
চন্দ্রহাস। এ তো বড়ো আশ্চর্য! তুমি বারে বারেই প্রথম,
তুমি ফিরে ফিরেই প্রথম। [৯]

বৃদ্ধ প্রকৃত অর্থে বৃদ্ধ নয়, সে নবীন হয়ে বালকরূপে আবার ফিরে আসছে পৃথিবীতে। বালকমনে তাই চিরনবীনতা ও চিরপ্রবীণতা বিস্ময়করভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের এ-বিশ্বাসই ব্যক্ত হয়েছে *ফাল্গুনী* নাটকের প্রতীকী আশ্রয়ে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর *আমার ধর্ম* প্রবন্ধে বলেছেন, ''পুরাতনই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আপন চিরনবীনতা প্রকাশ করে--''।[১০] এ বক্তব্যেরই বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে (১৩২২)। পত্রটিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতীকী নাটক *ফাল্গুনীর* মর্মার্থ বিশ্লেষণ করেছেনঃ

জগৎটার দিকে চেয়ে দেখলে দেখা যায় যে, যদিচ তার উপর দিয়ে যুগ যুগ চলে যাচ্ছে তবু সে জীর্ণ নয়— আকাশের আলো উজ্জ্বল, তার নীলিমা নির্মল। ধরণীর মধ্যে রিক্ততা নেই, তার শ্যামলতা অম্লান— অথচ খণ্ড খণ্ড করে দেখতে গেলে দেখি ফুল ঝরছে, পাতা শুকচ্ছে, ডাল মরছে।

জরামৃত্যুর আক্রমণ চারি দিকেই দিনরাত চলেছে, তবুও বিশ্বের চিরনবীনতা নিঃশেষ হল না। Facts-এর দিকে দেখি জরা মৃত্যু, Truth-এর দিকে দেখি অক্ষয় জীবন যৌবন। শীতের মধ্যে এসে যে-মুহূর্তে বনের সমস্ত ঐশ্বর্য দেউলে হল বলে মনে হল সেই মুহূর্তেই বসন্তের অসীম সমারোহ বনে বনে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। জরাকে, মৃত্যুকে

ধরে রাখতে গেলেই দেখি, সে আপন ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে প্রাণের জয়পতাকা উড়িয়ে দাঁড়ায়। পিছন দিক থেকে যেটাকে জরা বলে মনে হয় সামনের দিক থেকে সেইটেকেই দেখি যৌবন। তা যদি না হত তা হলে অনাদি কালের এই জগৎটা আজ শতজীর্ণ হয়ে পড়ত — এর উপরে যেখানে পা দিতুম সেইখানেই ধসে যেত।

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রতি ফাল্গুনে চিরপুরাতন এই যে চিরনূতন হয়ে জন্মাচ্ছে, মানুষপ্রকৃতির মধ্যেও পুরাতনের সেই লীলা চলছে। প্রাণশক্তিই মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আপনাকে বারে বারে নূতন করে উপলব্ধি করছে।....[১১]

মৃত্যুর ভেতর দিয়ে বার বার নব নব আত্মোপলব্ধির এই সৃষ্টি-প্রক্রিয়া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। সকল প্রকার সৃষ্টির মর্মমূলে ক্রিয়াশীল যে অতৃপ্তির বেদনা— যা স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান— সে-সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সজাগচিত্ত। রবীন্দ্রনাথের এ-প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে তাঁর *সৃষ্টির অধিকার* শীর্ষক প্রবন্ধে (১৩২০)। এক্ষেত্রে তাঁর বিশ্বাস, মনুষ্যজীবনের সকল কর্মের মধ্যে — যা হবার তা হয় নি বলে — একটি সূক্ষ্মতর অন্তর্বেদনা কার্যকর থাকায় পৃথিবীতে নিজ জন্মকে মানুষ সর্বদা সার্থক করতে চায়। জীবনের মধ্য দিয়ে মানুষ তার জন্মের অপূর্ণতা ঘোচাতে চায়। রবীন্দ্রনাথের মতে, স্রষ্টা ভগবান অন্য সকল প্রাণীকে পূর্ণ করে সৃষ্টি করলেও মানুষকে রেখেছেন অপূর্ণ। কেননা স্রষ্টা চান যে, ''তাঁর বিশ্বের মধ্যে কেবল মানুষই আপনাকে গড়ে তুলবে, আপনার ভিতরকার মনুষ্যত্বটিকে অবাধে প্রকাশ করবে। সেইজন্য তিনি মানুষের শিশুকে সকলের চেয়ে অসহায় করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তাকে উলঙ্গ ক'রে দুর্বল করে পাঠিয়েছেন।... কারণ এরই ভিতর থেকে তিনি তাঁর পরমা শক্তিকে দেখাবেন। যেখানে তাঁর শক্তি সকলের চেয়ে বেশি থেকেও সকলের চেয়ে প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে সেইখানেই তো তাঁর আনন্দের লীলা। এই দুর্বল মনুষ্যশরীরের ভিতর দিয়ে যে একটি পরমা শক্তি প্রকাশিত হবে এই তাঁর আহ্বান।''[১২] মনুষ্যজন্মের এই অপূর্ণতা অথচ তার মধ্যে স্রষ্টাপ্রদত্ত অপরিমেয় শক্তির প্রাচুর্য থেকেই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বালকবীরের বা বালকদেবতার কল্পনাটি আশ্রয়লাভ করেছে। বিশ্বমানবতত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে রবীন্দ্র নাথের *নববর্ষ* (১৩১৮) প্রবন্ধে। সেখানে তিনি বলেছেন, ''মানুষ যখনই মানুষের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে তখনই বিধাতা তাকে বলেছেন, 'তুমি বীর। তখনই তিনি তার ললাটে জয়তিলক এঁকে দিয়েছেন।'''[১৩] ফাল্গুনী নাটকে এরই প্রতিধ্বনি ভাষালাভ করেছেঃ ''বালক বীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয়—/এ কী গো বিস্ময়।''[১৪] *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে অমূল্যকে বাঁচাতে চেয়েছিল বিমলা। সন্দীপের স্বদেশীতত্ত্বের ভয়ঙ্কর অভিশাপ থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিল এই বালককে। কিন্তু

অমূল্য বাঁচে নি। সে তার নিজের জীবন দিয়ে বাঁচিয়ে গেছে বিমলাকে।অমূল্য সম্পর্কে বিমলার সর্বশেষ উপলব্ধিঃ

…অমূল্যর সেই আত্মোৎসর্গের দীপ্তিতে-সুন্দর বালকের মুখখানি যে কিছুতে ভুলতে পারছি নে। সে তো চুপ করে বসে ভাগ্যের প্রতীক্ষা করে নি, সে যে ছুটে গেল বিপদের মাঝখানে। আমি নারীর অধম তাকে প্রণাম করি—সে আমার বালকদেবতা, সে আমার কলঙ্কের বোঝা একেবারে খেলাচ্ছলে কেড়ে নিতে এসেছে! সে আমার মার নিজের মাথায় নিয়ে আমাকে বাঁচাবে, ভগবানের এমন ভয়ানক দয়া আমি সইব কেমন করে! বাছা আমার, তোমাকে প্রণাম। ভাই আমার, তোমাকে প্রণাম! নির্মল তুমি, সুন্দর তুমি, বীর তুমি, নির্ভীক তুমি, তোমাকে প্রণাম!…[১৫]

রবীন্দ্রনাথের বালক-বিষয়ক জীবনতত্ত্বের স্ফুরণ ঘটেছে এখানে। সে নির্মল, সে সুন্দর, সে বীর, সে নির্ভীক, সে দেবতা। বালককে দেবতা হিসেবে কল্পনার কারণ ব্যাখ্যকরে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ''…ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে বালকের সহিত দেবতার একটা সাদৃশ্য দেখা যায়। বালক যত সহজে ইচ্ছামাত্রই সৃজন করিতে পারে আমরা তেমন পারি না।''[১৬] আদিপ্রাণের উৎসের সঙ্গে মিলিয়ে উপনিষদ-পরিস্রুত যে-বালকতত্ত্বের কথা রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছেন *বলাই* গল্পে, যে-দর্শন ভাষালাভ করেছে প্রতীকের আশ্রয়ে *ফাল্গুনী* নাটকে, তারই অভিপ্রকাশ ঘটেছে বিমলার অভিজ্ঞতা-আশ্রিত উপর্যুক্ত উচ্চারণে।

২

ছুটি গল্পে ফটিক চরিত্রের মধ্য দিয়ে বালক-মনস্তত্ত্বের একটি প্রান্ত উন্মোচিত হয়েছে। অনাদর, পরাধীনতা, বালকমন সম্পর্কে অভিভাবকদের অজ্ঞতা ও বিরূপাচরণের শিকার হয়ে অভিমানাহত ফটিকের অকালমৃত্যু ঘটে এ গল্পে। পিতৃহীন এই বালকের স্বাধীন স্বেচ্ছাচারিতার ফলে তার মা ফটিকের প্রতি যথাযথ আচরণ করতে পারেন নি। মার সঙ্গে অভিমান করেই মূলত মামার বাড়িতে থাকার প্রস্তাবে সে সহজে সম্মত হয়। কিন্তু গ্রাম্যবালক ফটিককে শহুরে মামার সংসারে আরও বেশি অনাদর, অবহেলা, গঞ্জনা প্রভৃতি মানসিক চাপের শিকার হতে হয়। শহুরে জীবনধারার সঙ্গে সে পুরোপুরিভাবে খাপ-খাওয়াতে ব্যর্থ হয়। ''মা, আমাকে মারিস্ নে মা। সত্যি বলছি, আমি কোনো দোষ করি নি।''[১৭]—মৃত্যুর প্রাক্কালে জ্বর-আক্রান্ত ফটিকের প্রলাপোক্তিতে তার মনোযন্ত্রণার স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। ফটিকের মতো তের-চৌদ্দ বছরের বালকদের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্র-নাথের একটি ব্যাখ্যা এ গল্পে উপস্থাপিত হয়েছেঃ

বিশেষত, তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো-আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগল্‌ভতা। হঠাৎ কাপড়চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা না করিয়া বেমানানরূপে বাড়িয়া উঠে; লোকে সেটা তাহার একটা কুশ্রী স্পর্ধাস্বরূপ জ্ঞান করে। তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়, লোকে সেজন্য তাহাকে মনে মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ের কোনো স্বাভাবিক অনিবার্য ত্রুটিও যেন অসহ্য বোধ হয়।

সেও সর্বদা মনে মনে বুঝিতে পারে, পৃথিবীতে কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না; এইজন্য আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদা লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া থাকে। অথচ এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়। এই সময়ে যদি সে কোনো সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে স্নেহ কিংবা সখ্য লাভ করিতে পারে, তবে তাহার নিকট আত্মবিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে স্নেহ করিতে কেহ সাহস করে না, কারণ সেটা সাধারণে প্রশ্রয় বলিয়া মনে করে। সুতরাং তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মতো হইয়া যায়।

অতএব এমন অবস্থায় মাতৃভবন ছাড়া আর-কোনো অপরিচিত স্থান বালকের পক্ষে নরক। চারি দিকের স্নেহশূন্য বিরাগ তাহাকে পদে পদে কাঁটার মতো বিঁধে। এই বয়সে সাধারণত নারীজাতিকে কোনো-এক শ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকের দুর্লভ জীব বলিয়া মনে ধারণা হইতে আরম্ভ হয়, অতএব তাঁহাদের নিকট হইতে উপেক্ষা অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হয়। ১৮

বালক নীলকান্তের বয়ঃসন্ধিকালীন মনস্তাত্ত্বিক সংকট নিয়ে রচিত হয়েছে *আপদ* গল্প। তের- চৌদ্দ বছরের বালকমনে নারীজাতি-সম্পর্কিত নতুন উপলব্ধি বিষয়ে যে-ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ *ছুটি* গল্পে উপস্থাপন করেছেন, তারই শিকার বালক নীলকান্ত। ঝড়-বৃষ্টিতে ভিজে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ফটিকের অকালমৃত্যু ঘটেছিল, আর ঝড়ের রাতে নৌকাডুবির শিকার হয়ে দলচ্যুত নীলকান্তের আবির্ভাব ঘটে কিরণময়ীর সংসারে। গল্পের পরিণতিতে মাতৃহীন ব্যথিত বালকের তীব্র অভিমান নিয়ে নিরুদ্দেশ হয় সে। নীলকান্তের বয়স সতের-আঠারো হলেও বয়স অনুযায়ী তার শারীরিক বৃদ্ধি ঘটে নি ; যাত্রাদলে ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শনের প্রয়োজনেই যেন তার জীবনের গতিও 'বয়ঃসন্ধিস্থলে অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘকাল' থেমে থাকে। অতঃপর শরৎবাবুর পারিবারিক পরিবেশ এবং শরৎবাবুর স্ত্রী কিরণময়ীর অত্যধিক স্নেহের আঘাতে নীলকান্তের বয়ঃসন্ধি 'একসময় নিঃশব্দে' পার হয়ে যায়। ফলে কিছুদিন না-যেতেই তার প্রতি কিরণময়ীর বালকযোগ্য ব্যবহারে নীলকান্তের মনে জাগে নিদারুণ লজ্জা ও ব্যথা। নারী স্নেহের মাধুর্য সে উপলব্ধি করে স্পষ্টভাবে। ফলে এই স্নেহ থেকে যার জন্যে সে বঞ্চিত হয়, সেই সতীশের প্রতি তার মনে জাগে তীব্র ও জ্বালা-ধরা ঈর্ষা। দেবর সতীশের সঙ্গে কিরণময়ীর সুললিত হাস্য-পরিহাস খুনসুটি এবং নীলকান্তের প্রতি কিরণময়ীর অমনোযোগ-অবহেলা প্রভৃতির

ফলে সতীশের বিরুদ্ধে নীলকান্তের ঈর্ষাজাত মর্মযাতনা আরও বৃদ্ধি পায়। প্রতি মুহূর্তে সে কামনা করতে থাকে: ''আর-জন্মে আমি যেন সতীশ হই এবং সতীশ যেন আমি হয়।'' সতীশেরই মতো কিরণময়ীর কাছ থেকে স্নেহ-আদর লাভের প্রত্যাশা নিয়ে নীলকান্তের বুভুক্ষু হৃদয়ের ঈর্ষা তাকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে একসময় নিরুদ্দেশ করে দেয়। নীলকান্তের হৃদয়যন্ত্রণার প্রতি কিরণময়ীর নারীসুলভ প্রশ্রয় ও রবীন্দ্রনাথের শিল্পিহৃদয়ের সহানুভূতি যুক্ত হয়ে তা আবেদনবাহী হয়ে উঠেছে।

পরিণতিতে নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার মিল থাকা সত্ত্বেও চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে *অতিথি* গল্পের তারাপদের অবস্থান নীলকান্তের বিপরীত মেরুতে। স্নেহ-লাভের অতিরিক্ত প্রত্যাশা অথচ সেক্ষেত্রে বঞ্চনার হাহাকার নিয়ে নিরুদ্দেশ হয় নীলকান্ত। অন্য দিকে অতিরিক্ত স্নেহবন্ধন থেকে মুক্তির প্রত্যাশায় নিরুদ্দেশগমনে ব্রতী হয় তারাপদ। তারাপদ বোহেমীয় উদাসীন সত্তার জীবন্ত প্রতীক হয়ে উঠেছে। পিতৃহীন এই সুদর্শন ব্রাহ্মণবালক মাতৃস্নেহ কিংবা প্রতিবেশীদের কোনো প্রকার ভালোবাসার বন্ধনে আকৃষ্ট হয় নি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ''তাহার জন্মনক্ষত্র তাহাকে গৃহহীন করিয়া দিয়াছে।'' তারাপদ 'হরিণশিশুর মতো বন্ধনভীরু'। অন্তরের মধ্যে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ও মুক্ত, কল্পনাপ্রবণ, উদাসীন, অমলিন ও সকল প্রকার অভ্যাসবন্ধনমুক্ত তারাপদ স্বগৃহ ছেড়ে প্রথমে যাত্রাদলে, পরে পাঁচালির দলে, অবশেষে জিম্‌ন্যাস্টিকের দলে যোগ দেয়। কিন্তু কোনো বন্ধনই তাকে চিরস্থায়ীভাবে বাঁধতে পারে নি। নিত্যসচলা প্রকৃতির মতো সর্বদা সে নিশ্চিন্ত উদাসীন। বিশ্বমাতার মধ্যে যে চির নিরাসক্তি ও ঔদাসীন্য তারাপদের মধ্যেও যেন তা প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল। ফলে কাঁঠালিয়ার জমিদার মতিলাল বাবুর সংসারে দীর্ঘ দু'বছর ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থান করার পরও সেখানে 'স্নেহ-প্রেম-বন্ধুত্বের ষড়যন্ত্রবন্ধন' যখন চারদিক থেকে তাকে সম্পূর্ণরূপে ঘিরে ধরার উপক্রম করে, ঠিক তখন আজন্ম বোহেমীয় তারাপদ 'আসক্তিবিহীন উদাসীন জননী বিশ্বপৃথিবীর' টানে চলে যায়। পুত্রহীনা জমিদার-গৃহিণীর পুত্রবৎ স্নেহ কিংবা জমিদারকন্যা চারুশশীর বালিকাপ্রণয় সবকিছু উপেক্ষা করে কেবল প্রকৃতিজননীর আকর্ষণে সে সাড়া দেয়।

ডাকঘর নাটকের পিতৃমাতৃহীন বালক অমলও হয়ে উঠেছে বন্ধনমুক্তির প্রতীক। বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মা আক্রান্ত অচল অমল গৃহবন্দিত্ব থেকে মুক্তি প্রত্যাশী। রোগ-ক্লেশ তার মধ্যে জাগ্রত করেছে একদিকে কল্পনাপ্রবণতা, অন্য দিকে মুক্ত বিহঙ্গের মতো ডানা মেলে উড়ে বেড়ানোর ইচ্ছা। অমলের উক্তি: ''ভালো হলেই কিন্তু আমি চলে যাব।'' বা, "আমার ভারি ইচ্ছে করছে ঐ সময়ের সঙ্গে চলে

যাই— যে দেশের কথা কেউ জানে না সেই অনেক দূরে। কিংবা, "আমার যে আর বসে থাকতে ভালো লাগছে না। " খাঁচার পাখির মধ্যে আকাশে ওড়ার যে স্বপ্ন-ব্যাকুলতা, অমলের মধ্যেও সেরকম আকুলতা বর্তমান। দই বিক্রেতা, প্রহরী, মোড়ল, মালিনীর মেয়ে, ক্রীড়ামোদী বালকদল, ফকির, অন্ধ-খঞ্জ ভিক্ষুক— সকলের সঙ্গে কথাবার্তা-গল্পলায় অমলের এই বহির্মুখী ব্যাকুলতা প্রকাশিত হয়। "আমি, যা আছে সব দেখব—কেবলই দেখে বেড়াব। "— অমলের এ উক্তি অন্তত কল্পনার দিক থেকে তাকে তারাপদের সগোত্র করে তুলেছে। সংসারে বেমানান (misfit) হয়েছিল ফটিক। মামীর সংসারের বন্দিত্ব থেকে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার মুক্তি ঘটে। *অতিথি* গল্পের তারাপদ হয় পলায়নপর। ফটিকের পরিণতি বরণ করে অমল। রোগমুক্তির নামে কবিরাজ যে ব্যবস্থাপত্র দেয় অমলের জন্য, তা শাস্ত্রসম্মত হলেও তার মনোপ্রবাহের অনুকূল না-হওয়ায় তাতে রোগ যায় বেড়ে। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই মুক্তিঃ ঘটে অমলের।

রক্তকরবী নাটকে কিশোর নামক যে-বালকের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, সে অন্য সকল বালকের থেকে স্বতন্ত্র। রূপমুগ্ধ এ বালক রূপপূজায় নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করতে উদগ্রীব। কোনো অত্যাচার, নিপীড়ন, প্রতিকূলতা তার সৌন্দর্যসাধনাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে নি। অফুরন্ত তার প্রাণশক্তি। সকল শাস্তি সকল নির্যাতন সে আনন্দচিত্তে সইতে পারে—এমনকি মৃত্যুকেও। কিশোরের উক্তি "শাস্তিতে তো আমাকে বাজবে না, আমার বয়স অল্প, আমি খুশি হয়ে সইতে পারব। " নির্ভীক তার চিত্ত। *ফাল্গুনী* নাটকে যে বালক-বীরের বিস্ময়কর বিশ্বজয়ের কথা বলা হয়েছে, কিশোর-চরিত্রের মধ্যে তারই বাস্তব রূপ লক্ষ করা যায়। নন্দিনীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ এ বালক নন্দিনীর জন্যে মৃত্যুকেও অবহেলা করে—নন্দিনীর প্রণয়ভাজন রঞ্জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নন্দিনীপ্রদত্ত রক্তকরবীর গুচ্ছ তার হাতে পৌছায়। সৌন্দর্য-উপাসক কিশোরের জীবনপ্রদীপ নির্বাপিত হয় সৌন্দর্যেরই সাধনায়। কিশোর সম্পর্কে তার হত্যাকারী রাজার উক্তি "সে যে অদ্ভুত ছেলে। বালিকার মতো তার কচি মুখ, কিন্তু উদ্ধত তার বাক্য। সে স্পর্ধা করে আমাকে আক্রমণ করতে এসেছিল। " নাটকের সূচনাতেই নন্দিনীর প্রতি কিশোরের সৌন্দর্যমুগ্ধতার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিশোর রক্তকরবী ফুল দিয়ে সৌন্দর্যদেবী নন্দিনীর প্রতি তার প্রণতি জানায় : "সমস্তদিন তো কেবল সোনার তাল খুঁড়ে আনি, তার মধ্যে একটু সময় চুরি করে তোর জন্যে ফুল খুঁজে আনতে পারলে বেঁচে যাই।"

যোগাযোগ উপন্যাসে হাবলু (শ্রী মতিলাল ঘোষাল) বৃন্দাবনের গোপাল-রূপে কুমুর হৃদয়ে স্থান লাভ করেছে। এ রাধার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী গোপাল-কৃষ্ণ নয়, এ অত্যাচারী কংস-বিনাশক কৃষ্ণ-গোপাল—রাজ্যশাসনে শান্তি পুনঃস্থাপনের ভগবান -প্রদত্ত কর্তব্য নিয়ে অবতাররূপে মর্ত্যভূমিতে যার আগমন ঘটেছে।

বিয়ের পরে মধুসূদনের কোলকাতার প্রাসাদে প্রথম রাত্রির কোলাহলশেষে কুমুর দাম্পত্যজীবনের যখন প্রকৃত সূচনা হতে যাচ্ছে তখন মনের মধ্যে সে কোনোভাবে দেবতাকল্প স্বামী ও বাস্তব স্বামীকে মেলাতে পারছে না। এমন এক মানসিক সংকটকালে কুমু যখন দেবতার শরণাপন্ন হচ্ছে, ঠিক তখন বালকদেবতা হাবলু (কুমুর ভাষায় গোপাল)-এর আবির্ভাব ঘটে এ-উপন্যাসে। ''কুমুর বুকের ভিতরটা তখন টনটন করছিল —এই ছেলেকে বুকে চেপে ধরে যেন বাঁচল। হঠাৎ কেমন মনে হল কতদিন ঠাকুরঘরে যে গোপালকে ফুল দিয়ে এসেছে, এই ছেলেটির মধ্যে সে-ই ওর কোলে এসে বসল। ঠিক যে-সময়ে ডাকছিল সেই দুঃখের সময়েই এসে ওকে বললে, ''এই যে আমি আছি তোমার সান্ত্বনা।'' ...এই এতটুকুতেই কুমুর মনের ভার গেল হালকা হয়ে। ওর মনে হল প্রার্থনার জবাব পেলুম, জীবনের সমস্যা সহজ হয়ে দেখা দেবে এই ছোটো ছেলেটির মতোই।''[১৯] ফুলশয্যার রাতে মূর্ছিত কুমু জ্ঞান ফিরে পেয়ে যখন ''মনে মনে ঠাকুরের নাম করে প্রণাম করলে। (তখন) ঘরের অন্য পাশে একটা তক্তাপোশের উপর হাবলু গভীর ঘুমে মগ্ন— তার পাশে গিয়ে তার কপালে চুমো খেলে।''[২০] এর পরেও মধুসূদনের সঙ্গে কুমুর দাম্পত্যসংকটের সময়গুলোতে সর্বদা হাবলুর আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। কুমুর মনে যখন প্রশ্ন ''আজ থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মনের গভীর আকাঙ্ক্ষা কি ঐ ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতোই কেবল সঙ্গীহীন নিঃশ্বসিত হয়ে উঠবে?''[২১] কুমুর ব্যথিত যৌবন যখন তার পূজার অর্ঘ্য কোথায় দেবে তা খুঁজে মরছে; যতই প্রাণপণে গাইছে, ''মেরে গিরিধর গোপাল, ঔর নাহি কোহি'', ততই সে-গান শূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং সেই শূন্যতায় কুমুর মন ভয়ে ভরে উঠছে ; কুমুর কাছে যখন মনে হচ্ছে ''সময় একটা অতলস্পর্শ গর্তের মতো শূন্য হয়ে যেন হাঁ করে আছে;[২২] যখন মনে হয়েছে, ''একটা কালো কঠোর ক্ষুধিত জরা বাহির থেকে কুমুকে গ্রাস করছে রাহুর মতো।... যা লালায়িত, যার সংযমের শক্তি শিথিল, যার প্রেম বিষয়াসক্তিরই স্বজাতীয়, তারই স্বেদাক্ত স্পর্শে''[২৩] কুমুর মনে যখন তীব্র বিতৃষ্ণা, তখনই সে গোপালের (হাবলু) সাহচর্য কামনা করেছে। গোপাল (হাবলু) যেন তার এই ক্লেদ-নিমজ্জিত অস্তিত্ব থেকে উদ্ধারলাভের একমাত্র উপায়, যেন 'বৃদ্ধ অশুচিতার কাছ

থেকে নবীন নির্মলতার মধ্যে, দূষিত নিশ্বাসবাষ্প থেকে ফুলের বাগানের হাওয়ায়' [২৪] উত্তরণের একান্ত সহায়।

৩

বালকের সাহচর্যে নারীমনে মাতৃত্ব-উপলব্ধি, অতঃপর হৃদয়ে ঔদার্যের স্ফূর্তি, 'শতবন্ধন-জাল-জটিল' এ জীবনে প্রশান্তি লাভ, দ্বিধা ও সংশয়মুক্তির প্রাণাবেগ সৃষ্টি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যও রবীন্দ্রকথাসাহিত্যের এক উজ্জ্বল প্রান্ত। *দিদি* গল্পে পিতৃসংসারে নতুন ভ্রাতার আগমনের ফলে একমাত্র কন্যাসন্তান হিসেবে শশিকলার মনে প্রথমে স্নেহ ও সম্পত্তির নতুন অংশীদারের প্রতি তীব্র ঈর্ষার সঞ্চার হয়। কিন্তু শিশু নীলমণি দু' বছরের মধ্যে পিতৃমাতৃহারা হলে শশিকলার নারীহৃদয়ে মাতৃত্বের জাগরণ ঘটে। ফলে শিশুভ্রাতার প্রতি তার মনের সকল বিদ্বেষ-বিরূপতার অবসান হয়। একদিকে শশিকলার প্রতি বালকভ্রাতা নীলমণির নিষ্পাপ নিরুদ্বিগ্ন নির্ভরতা, অন্যদিকে নীলমণিকে তার সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ব্যাপারে স্বামী জয়গোপালের কুটিল ষড়যন্ত্র প্রভৃতি নীলমণির প্রতি শশিকলার স্নেহ ভালোবাসা ও দায়িত্বকে আরও বাড়িয়ে তোলে। শশিকলার এ-ভ্রাতৃসহানুভূতি পতির প্রতি ভক্তিপরায়ণ নারীকেও করে তোলে সাহসী, বিদ্রোহী, প্রতিবাদী। বালকভ্রাতার স্বার্থ রক্ষার স্বামী-বিরোধী সংগ্রামে শশিকলা জয় ছিনিয়ে আনে, কিন্তু স্বামীর হাতে নির্মম মৃত্যু ঘটে তার।

অতিথি গল্পে ব্রাহ্মণবালক তারাপদর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই পুত্রহীনা জমিদারগৃহিণী অন্নপূর্ণার হৃদয় স্নেহে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। তাঁর চিত্তে জাগ্রত-মাতৃত্বের প্রশ্ন : ''ইহার মা ইহাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া প্রাণ ধরিয়া আছে।'' অন্নপূর্ণার মাতৃহৃদয় এই বালককে চিরস্থায়ীভাবে নিকটবর্তী করার সংকল্পে দৃঢ় হয়। কিন্তু বন্ধনভীরু তারাপদর কাছে মানবমাতার চেয়ে প্রকৃতিজননীর আকর্ষণ তীব্র বলে অন্নপূর্ণার মাতৃ-আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকে।

চোখের বালি উপন্যাসে আট বছরের ব্রাহ্মণবালক বসন্তের আবির্ভাব ঘটে অকস্মাৎ এবং হঠাৎ-করেই তার প্রসঙ্গ আর-উল্লেখের প্রয়োজন বোধ করেন না ঔপন্যাসিক। উদ্‌ভ্রান্ত দিগ্‌ভ্রান্ত বিচলিত ও লক্ষ্যচ্যুত বিনোদিনীর মনের অবস্থা যখন হালভাঙা-পালছেঁড়া নৌকার মতো, মহেন্দ্রের উদগ্র কামনার বহ্নি থেকে বাঁচার আশায় যখন সে বিহারীর শরণাপন্ন— তখনই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে

বসন্তের। বিনোদিনীর অশান্ত উত্তপ্ত হৃদয়ের সান্ত্বনা হিসেবে বসন্ত নিঃশব্দে তার পাশে এসে দাঁড়ায় :

এমন সময়, পায়ে জুতা নাই, গায়ে জামা নাই, বসন্ত তাহার পরিস্ফুট গৌরসুন্দর দেহ লইয়া বিহারীর চৌকির কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীরমুখে বিনোদিনীকে দেখিতে লাগিল। বিহারী জিজ্ঞাসা করিল, ''শুতে যাস নি যে?'' বসন্ত কোনো উত্তর না দিয়া গম্ভীরমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিনোদিনী দুই হাত বাড়াইয়া দিল। বসন্ত প্রথমে একটু দ্বিধা করিয়া, ধীরে ধীরে বিনোদিনীর কাছে গেল। বিনোদিনী তাহাকে দুই হাতে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিল।[২৫]

যে-কামনার বহ্নি বিনোদিনীর স্থিরচিত্তকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছিল, বালক বসন্তের নিঃশব্দ উপস্থিতিতে যেন সে-অগ্নি নির্বাপিত হয়ে যায়। ভোগের সামগ্রী হিসেবে নয়, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিয়ে বেঁচে-থাকার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা —বালকের উপস্থিতিতে এই বিবেচনাবোধ জাগ্রত হয় বিনোদিনীর মনে। অতঃপর বিনোদিনীর কল্পনায় আর-একবার আমরা এই বালকের স্নিগ্ধ ছবি উদ্ভাসিত হতে দেখি

...সেই জলের কলওয়ালা ছোটো আঙিনা, সেই সিঁড়ি, সেই সুসজ্জিত পরিপাটি আলোকিত নিভৃত ঘরটি— সেখানে নিস্তব্ধ শান্তির মধ্যে বিহারী একলা কেদারায় বসিয়া আছে— হয়তো কাছে সেই ব্রাহ্মণ-বালক, সেই সুগোল সুন্দর গৌরবর্ণ আয়তনেত্র সরলমূর্তি ছেলেটি নিজের মনে ছবির বই লইয়া পাতা উলটাইতেছে— একে একে সমস্ত চিত্রটা মনে করিয়া স্নেহে প্রেমে বিনোদিনীর সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ পুলকিত হইয়া উঠিল।....[২৬]

নৌকাডুবি উপন্যাসেও কমলা-রমেশের স্টীমার যাত্রায় কাজের সঙ্গী হিসেবে কায়স্থবালক উমেশের আবির্ভাব ঘটে আকস্মিকভাবে। উমেশের মধ্যস্থতায় রমেশের সঙ্গে কমলার সংকোচ যখন ধীরে ধীরে কেটে যেতে থাকে, দুজনের সম্পর্কের জটিলতাও তখন শুরু হয়। রমেশের সঙ্গে সম্পর্কের রহস্যজনক জটিলতা কমলার কাছে অজ্ঞাত থাকায় রমেশের কিছু বক্তব্য ও আচরণ তার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকে। তখন বালক উমেশের সাহচর্যে জাগ্রত মাতৃত্ব কমলার অভিমানাহত নারীহৃদয়ে প্রশান্তি আনে: " মাতৃহীন বালকের মুখে মা-সম্ভাষণ শুনিয়া বালিকার কোমল হৃদয়ের কোন্ এক গভীরদেশ হইতে জননী সাড়া দিল।''[২৭] রমেশের কাছ থেকে যুক্তিহীন ব্যাখ্যা-অযোগ্য নির্লিপ্ত আচরণের আঘাতে কমলার বালিকামন যখন বেদনাপিষ্ট জর্জরিত, তখন বিমাতার সংসারের উপেক্ষা থেকে পলায়নপর মাতৃহারা বালক উমেশই কমলার একমাত্র সান্ত্বনা : ''এই গৃহহীন দরিদ্র বালকটার কাছ হইতে একটা যত্নের কথা শুনিবামাত্র কমলা আপনার বুক-ভরা অকর ভার আর

রাখিতে পারিল না।''...২৮ অতঃপর কমলা যখন তার প্রকৃত স্বামী নলিনাক্ষ চট্টোপাধ্যায়ের অনুসন্ধান লাভ করল —অথচ তার আশ্রয়দাতা পরিবারের নিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত তাকে নলিনাক্ষের কাছ থেকে দূরে নিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্যত —তখনকার সেই সংকট থেকেও কমলাকে উদ্ধার করল উমেশ :

গাড়ি ছাড়িবার সময় হইয়া আসিতেছে, এমন সময় কমলা হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া শুনিতে পাইল তাহাকে কে পরিচিত কণ্ঠে ''মা'' বলিয়া ডাকিয়া উঠিয়াছে। কমলা প্ল্যাট্‌ফর্মের দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিল—উমেশ।
কমলার সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; ''কহিল, কী রে উমেশ!'' উমেশ গাড়ির দরজা খুলিয়া দিল এবং মুহূর্তের মধ্যে কমলা নামিয়া পড়িল।....২৯

সর্বশেষ, স্বামীগৃহে কমলা যখন অপরিচিত এবং দাসী হিসেবে নিযুক্ত, তখনও তার সান্ত্বনার পাত্র উমেশ। উমেশ তার গঙ্গাঘাটে যাওয়ার সঙ্গী।

ঘরে/ বাইরে উপন্যাসে পিতৃহীন অষ্টাদশবর্ষীয় বালক অমূল্যর আগমনও ঘটে আকস্মিকভাবে। সন্দীপের সাহচর্যে এবং তার স্বদেশী-ভাবনার সম্মোহনী টানে বিমলা যখন অধঃপতনের স্রোতে ভেসে-যাওয়ার উপক্রম করেছে, তার নীতিধর্মের গ্রন্থি যখন শিথিল হয়ে ছিন্ন হতে আর-একটিমাত্র টান বাকি আছে, ঠিক সে-মুহূর্তে অমূল্য আবির্ভূত হয়েছে এ-উপন্যাসে। অমূল্যর কল্যাণেই বিমলা তার নারীধর্ম সতীধর্ম রক্ষা করে নিজ সংসারে পুনঃস্থাপিত হতে সক্ষম হয়। এ অমূল্যই স্বদেশী-তত্ত্বের নেশায় মত্ত হয়ে কোনো-এক বৃদ্ধকে হত্যার ব্যাপারে নির্দ্বিধ-নিষ্কম্প মানসিকতার পরিচয় দেয়, বিমলার মধ্যে তখন জাগ্রত হয় মাতৃহৃদয়:

সন্দীপের মুখের বুলি বালকের মুখে শুনে বুক কেঁপে উঠল। ও যে নিতান্ত কাঁচা, ভালোকে ভালো বলে বিশ্বাস করবারই যে ওর সময়। আহা, ওর যে বাঁচবার বয়েস, বাড়বার বয়েস। আমার ভিতরে মা জেগে উঠল যে! নিজের দিক থেকে আমার ভালোও ছিল না, মন্দও ছিল না, ছিল কেবল মরণ মধুর রূপ ধ'রে, কিন্তু যখন এই আঠারো বছরের ছেলে এমন অনায়াসে মনে করতে পারলে একজন বুড়োমানুষকে বিনা দোষে মেরে ফেলাই ধর্ম তখন আমার গা শিউরে উঠল। যখন দেখতে পেলুম ওর মনে পাপ নেই তখন ওর এই কথার পাপ বড়ো ভয়ংকর হয়ে আমার কাছে দেখা দিলে। যেন বাপমায়ের অপরাধকে কচি ছেলের মধ্যে দেখতে পেলুম।৩০

স্বর্গের অপ্সরী-সত্তা থেকে বিমলার মধ্যে স্বর্গের ঈশ্বরী-সত্তা জেগে উঠল। বিমলার মধ্যে সূচিত হলো বিরাট পরিবর্তন: ''অমূল্য তার তরুণ মুখের দীপ্তিরেখা আমার জীবনের মধ্যে নূতন উষার প্রথম-অরুণলেখাটির মতো এঁকে দিয়ে গেল।'' বিমলার মধ্যে জাগ্রত-মাতৃত্বের আরও স্পষ্ট উপলব্ধি:

অমূল্য আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল, সেই বালক, সে আমার মায়ের গর্ভে জন্মেছিল-সেই মা, সে যে একই মা। আহা, এ কচি মুখ,জন্মায় নি বটে, কিন্তু সে তার মায়ের গর্ভে ঐ স্নিগ্ধ চোখ, ঐ তরুণ বয়েস! আমি মেয়েমানুষ, আমি ওর মায়ের জাত...৩১

সন্দীপ বিমলাকে দেশমাতৃকার সঙ্গে তুলনা করে। মাতৃরূপা নারী এবং দেবীরূপ দেশমাতা যে-সমার্থক এ অনুভবের কথা বলে সন্দীপ বিমলার মধ্যে দেশমাতারূপী দেবীসত্তা জাগ্রত করার প্রয়াস পায়। কিন্তু সন্দীপের বিশ্বাস ও বক্তব্যে ছিল কপটতা। ফলে বিমলার মধ্যে দেবীসত্তা জাগ্রত হলেও মাতৃত্ব জাগে নি; জেগেছে দেবী-সহচরীরূপ। অমূল্যই প্রকৃত মাতৃত্ব তার মধ্যে জাগ্রত করতে সমর্থ হয়। সে কারণে নবচৈতন্যের শক্তি দিয়ে বিমলা সন্দীপের কপট-শিক্ষাকে আঘাত করে দূরে সরাতে সক্ষম হয় :

আমি বিদ্যুতের মতো অমূল্যের মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখলুম, হঠাৎ একটা চাবুক খেয়ে তার মুখ যেন বিবর্ণ হয়ে গেছে। আমি আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে সন্দীপকে ঠেলা দিলুম।[৩২]

অতঃপর আনন্দদীপ্ত অমূল্য যখন বিমলার পায়ের ধুলো নিয়ে তার পায়ের কাছে বসে, তখন বিমলাও মিথ্যার কুহক ভেঙে, অশ্রদ্ধার মিথ্যা জাল ছিন্ন করে প্রকৃত শ্রদ্ধার আসনে নিজেকে উপবিষ্ট করে। অমূল্যের উদ্দেশে বিমলার অনুচ্চারিত উক্তি : ''ওরে ভাই, ওরে বাছা, তোর এই শ্রদ্ধাটুকু আজ আমার শূন্য বিশ্বপাত্রের শেষ সুধাবিন্দু।'' অমূল্যের শ্রদ্ধাই বিমলাকে পবিত্র করে, বিমলার মনে নতুন উপলব্ধি সঞ্চার করে।

৪

রবীন্দ্রকথাসাহিত্যে বালক কখনও কখনও সত্যোপলব্ধির সহায়, শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা এবং নিঃসঙ্গ জীবনে সান্ত্বনার কারণ হয়ে উঠেছে। *আপদ* গল্পে রোগক্লিষ্ট কিরণময়ীর নিঃসঙ্গ নারীহৃদয়ের স্নেহ ও দয়া মৃত্যুমুখ থেকে বেঁচে-ওঠা একটি বালকের (নীলকান্ত) প্রতি অত্যধিক মাত্রায় বর্ষিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে তাকে আরোগ্য করে তোলে। এরই পূর্ণ পরিণতি ঘটে সমবয়সী দেবর সতীশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও লঘু হাস্য-পরিহাসের সুযোগ পেয়ে।

বিসর্জন নাটকে পালিত-বালক ধ্রুব নিঃসন্তান রাজা গোবিন্দমাণিক্যের হৃদয়ের সমস্ত স্থান জুড়ে আছে। এ বালক রাজাকে করেছে সকল সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত, অথচ রানীকে করেছে ঈর্ষাদগ্ধ। রাজপালিত এই বালকের প্রতি ঈর্ষাকাতর রানী গুণবতীর উক্তি: ''রাজার হৃদয়রত্ন এই সে বালক!/ ওরে শিশু, চুরি করে নিয়েছিস তুই / আমার সন্তানতরে যে আসন ছিল। / না আসিতে আমার বাছারা,

তাহাদের/পিতৃস্নেহ—'পরে তুই বসাইলি ভাগ!/ রাজহৃদয়ের সুধাপাত্র হতে, তুই নিলি প্রথম অঞ্জলি—রাজপুত্র এসে/ তোরি কি প্রসাদ পাবে ওরে রাজদ্রোহী!''৩৩ একই পটভূমি নিয়ে রচিত *রাজর্ষি* উপন্যাসে রাজপালিত এই বালকের ভূমিকা আরও বিস্তৃত, তার পরিচয় আরও স্পষ্ট। *রাজর্ষি* উপন্যাসে পিতৃমাতৃহীন বালক ধ্রুব রাজা গোবিন্দমাণিক্যের বুক আশ্রয় করে তাকে প্রথম মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচায়। এ প্রসঙ্গে রাজার উক্তিঃ ''তুমিই আজ রক্তপাত হইতে ধরণীকে রক্ষা করিলে, সেই উদ্দেশেই তোমার দিদি তোমাকে রাখিয়া গিয়াছেন।'' এই ধ্রুব ও তার বোনের 'এত রক্ত কেন?' প্রশ্নই রাজার মনে সত্যোপলব্ধির কারণ হয়েছিল। অতঃপর মন্দিরে জীববলি নিষিদ্ধ করে রাজা গোবিন্দমাণিক্য রাজপুরোহিত রঘুপতির নানা কুটিল ও নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রের শিকার হন। রঘুপতি রাজভ্রাতা নক্ষত্ররায়কেও এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করে। এসব কারণে রাজার মন যখন উদ্বিগ্ন অশান্ত বিচলিত বিষন্ন ও বিষাদগ্রস্ত, তখন ধ্রুবর সরল-সাহচর্য তাকে শান্ত ও সুস্থ রাখে। ধ্রুবর শিশুত্ব এক্ষেত্রে বিশল্যকরণীর কাজ করে। ধ্রুব ছাড়া অন্য বালকদলের উপস্থিতি এ উপন্যাসে আর দু'স্থানে লক্ষ করা যায়। নিজ ভ্রাতা কর্তৃক রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে রাজা গোবিন্দমাণিক্য তার নিঃসঙ্গ নির্বাসন জীবনে এবং রাজপুরোহিত বিল্বন মানবসেবা উপলক্ষে বালকদের নিয়ে নিজ নিজ ভুবন গড়ে তোলেন। সভ্যতাকে অগ্রসর করে নেওয়ার জন্য বালকদের সেবা ও শিক্ষিত করে তোলা প্রতিটি মানুষের যে মহান কর্তব্য, তা রাজা গোবিন্দমাণিক্য ও বিল্বনের আচরণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উভয়ের মানসিক শান্তি ও সুস্থতার কারণও হয়েছে ঐ বালকদল।

চোখের বালি উপন্যাসে বিহারী যখন আবাল্য-বন্ধু মহেন্দ্রের কাছ থেকে সম্পূর্ণ যুক্তিহীনভাবে উপর্যুপরি আঘাত লাভ করেছে, এমনকি যে-গৃহে ছিল তার অবাধ যাতায়াত মহেন্দ্রের সেই গৃহদ্বারও তার জন্য হয়েছে রুদ্ধ, আশা ও অন্নপূর্ণার কাছ থেকে অস্বাভাবিক ও অচিন্ত্যনীয় বিরূপ আচরণের শিকার হয়েছে, মহেন্দ্র-বিনোদিনীর অকল্যাণময় প্রণয় প্রত্যক্ষ করে বিনোদিনীর প্রতি হারিয়েছে শ্রদ্ধা—স্বাভাবিকভাবে তখন সে দারুণভাবে নিঃসঙ্গ, স্নেহ-ভালোবাসাহীন প্রতিকূল পরিবেশে পীড়িত। বিহারীর জীবনে, এ ধরনের বিরূপ পরিস্থিতিতে, ব্রাহ্মণবালক বসন্তের আবির্ভাব ঘটে। বিহারী তার প্রতিবেশী এক ব্রাহ্মণের পুত্রকে শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ করে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে। বসন্তকে শিক্ষাদান ও তার সঙ্গে ক্রীড়া-চ্ছলে তার সাহচর্য লাভের মধ্য দিয়ে বিহারী বিরূপবিশ্বকে ভুলে মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে চেয়েছে। ক্রীড়া ও কৌতুকচ্ছলে বিহারী বসন্তের মেধার বিকাশ সাধনে তৎপর— এমন এক মনোরম, স্নিগ্ধ, কলুষতা ও মানসিক জটিলতামুক্ত সান্ধ্য

পরিবেশের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এ-উপন্যাসে। উক্ত দৃশ্যে সকল প্রকার ক্লেদ ও গ্লানিমুক্ত, বালক-সাহচর্যে সম্পূর্ণ নতুন, এক বিহারীর রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি :

বিহারী তাহাকে নিজের প্রণালীমতে শিক্ষা দিতে লাগিল। বলিল, ''দশ বৎসর বয়সের পূর্বে আমি ইহাকে বই পড়াইব না, সব মুখে মুখে শিখাইব।'' তাহাকে লইয়া খেলা করিয়া, তাহাকে লইয়া গড়ের মাঠে, মিউজিয়ামে, আলিপুর-পশুশালায়, শিবপুরের বাগানে ঘুরিয়া বিহারী দিন কাটাইতে লাগিল। তাহাকে মুখে মুখে ইংরাজি শেখানো, ইতিহাস গল্প করিয়া শোনানো, নানাপ্রকারে বালকের চিত্তবৃত্তি পরীক্ষা ও তাহার পরিণতিসাধন, বিহারীর সমস্তদিনের কাজ এই ছিল — সে নিজেকে মুহূর্তমাত্র অবসর দিত না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় বাহির হইবার জো ছিল না। দুপুর বেলায় বৃষ্টি থামিয়া আবার বিকল হইতে বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। বিহারী তাহার দোতলার বড়ো ঘরে আলো জ্বালিয়া বসিয়া বসন্তকে লইয়া নিজের নূতন প্রণালীর খেলা করিতেছিল।
''বসন্ত, এ ঘরে ক'টা কড়ি আছে, চট্ করিয়া বলো। না, গুনিতে পাইবে না।''
বসন্ত। কুড়িটা।
বিহারী। হার হইল— আঠারোটা।
ফস করিয়া খড়খড়ি খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ''এ খড়খড়িতে ক'টা পাল্লা আছে?''
বলিয়া খড়খড়ি বন্ধ করিয়া দিল।
বসন্ত বলিল, ''ছয়টা।''
''জিত।''-- ''এই বেঞ্চিটা লম্বায় কত হইবে? এই বইটার কত ওজন?'' এমনি করিয়া বিহারী বসন্তর ইন্দ্রিয়বোধের উৎকর্ষসাধন করিতেছিল, ...৩৪

ঘরে-বাইরে উপন্যাসে বালক অমূল্য বিমলার হৃদয়ে সত্যোপলব্ধির সহায় হয়েছে। সন্দীপ যখন বিমলাকে সংসারের সাধারণ নারীর আসন থেকে টেনে নামিয়ে দেবীর আসনে বসিয়েছে, সন্দীপের কথায় বিমলার মনেও আস্থা সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ সে-ও নিজেকে দেবীরূপী শক্তিতত্ত্বে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে, অমূল্যের আবির্ভাব ঘটে ঠিক তখন: ''একদন্ড পরেই আমি দেখতে পেলুম তার চোখের তারার মধ্যে একটা নূতন দীপ্তি জ্বলে উঠল, বুঝলুম সে আদ্যাশক্তিকে দেখতে পেয়েছে, বুঝতে পারলুম ওর রক্তের মধ্যে আমারই সৃষ্টির কাজ আরম্ভ হয়েছে।''৩৫ এই বিমলার মধ্যেই ধীরে ধীরে পরিবর্তন এল। সন্দীপের স্বদেশ-ভাবনায় প্রভাবিত হয়ে তার মনে যে-বিশ্বাস জন্মেছিল, বালকের কচিমুখ এবং তার প্রভাবে আপন-হৃদয়ে জাগ্রত মাতৃত্ব বিমলার সেই বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিতে ধস নামায়। বিশ্বাসের উপাদানগুলোকে নতুন করে সে পুনরায় মূল্যায়ন করে। দেশসেবার নামে নিজের সিন্দুক থেকে স্বর্ণচুরির পর তার উপলব্ধি:

...ঘরকে তো আমি দেশ থেকে স্বতন্ত্র করে দেখতে পারলুম না। আজ ঘরকে লুটেছি, দেশকেই লুটেছি; এই পাপে একই সঙ্গে ঘর আমার ঘর রইল না, দেশও হয়ে গেল পর। আমি যদি ভিক্ষে করে দেশের সেবা করতুম এবং সেই সেবা সম্পূর্ণ না করেও মরে যেতুম, তবে সেই অসমাপ্ত সেবাই হত পূজা, দেবতা তা গ্রহণ করতেন। কিন্তু চুরি তো পূজা নয়;...৩৬

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, মহৎ লক্ষ্য সাধনের জন্যে সেই লক্ষ্যে পৌছার পথটিকেও অবশ্যই মহৎ হতে হবে। নীতিদুষ্ট পথ অবলম্বন করে নীতিনিষ্ঠ উদ্দেশ্য সাধন কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এ কারণেই বিমলার কাছে চুরিকে পুজো বলে স্বীকার করা অসম্ভব ঠেকেছে। অমূল্য কেবল বিমলার মন থেকেই মিথ্যার কুহক দূর করে নি, সন্দীপের মনে বিমলা-সম্পর্কিত নেশার ঘন মেঘকেও নির্মলতার বাণ নিক্ষেপের মাধ্যমে মাঝে মাঝে দিয়েছে ছিদ্র করে। সন্দীপের আত্মকথায় এর পরিচয় সুস্পষ্ট :

বিমলা চলে গেলে ঘরের ভিতরকার হাওয়া যেন আরো বেশি মাতাল হয়ে উঠল। সূর্য অস্ত যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে তবে যেমন আকাশের মেঘ রঙে রঙে রঙিন হয়ে ওঠে, তেমনি বিমলা চলে যাওয়ার পরে আমার মনটা রঙিয়ে রঙিয়ে উঠতে লাগল।···
এই নেশার আবেশে রক্তের মধ্যে যখন ঝিম্‌ঝিম্ করছে এমন সময়ে বেহারা এসে খবর দিলে অমূল্য আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।···
তার পর নুন-চিনি-কাপড়ের লড়াইয়ের খবর। তখনই ঘরের হাওয়া থেকে নেশা ছুটে গেল।····৩৭

রক্তকরবী নাটকে যক্ষপুরীর অন্ধকার নির্দয় নিষ্প্রাণ স্নেহহীন পরিবেশে নন্দিনী নিজে এক আলোর ঝলক, প্রাণের অফুরন্ত বন্যা। প্রকান্ড নিষ্ঠুরতার প্রতীক পাষাণহৃদয় রাজাও এ-নাটকে সেই প্রাণের বন্যায় শেষ পর্যন্ত ভেসে যায়। নন্দিনীর চিত্তগত শক্তি ও সাহসের মূলে রয়েছে প্রণয়। এ নাটকে বালক 'কিশোর'-এর নির্ভীকতা, সরল হৃদয়ের প্রাণ উজাড়-করা ভালোবাসার পূজা নন্দিনীর প্রণয়কে করেছে তেজোদীপ্ত।

৫

রবীন্দ্রকথাসাহিত্যে সর্বত্রই বালকচরিত্রের কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। বালকচরিত্র মূলত নির্ভীক চিরনবীন ও অফুরন্ত প্রাণশক্তির আধার। যেমন *সবুজের অভিযান* কবিতায় ''চিরযুবা তুই যে চিরজীবী/··· প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি।'' *ফাল্গুনী* নাটকে বালকদলের স্বীকারোক্তিঃ আমাদের মধ্যে রয়েছে কেবল পাগলামি, ছেলেমানুষি, সবাই আমাদের বোঝবার আশা ছেড়ে দিয়েছে, আমাদের ছুটি, আমরাই শুধু চলি, আমরা অদ্ভুত, আমরা খামকা খুশি হয়ে উঠি, আমরা ভালো কাজ করছি নে, পাড়াকে আমরা নাড়া দিই, পাড়া আমাদের তাড়া দেয়। বালকদল আরও বলে : ''কাজকে কভু আমরা না ডরাই। / খেলা মোদের লড়াই করা, / খেলা মোদের বাঁচা মরা, / খেলা ছাড়া কিছুই কোথাও নাই।''৩৮ কিংবা, ''আমাদের পাকবে না চুলগো—মোদের / পাকবে না চুল।/আমাদের ঝরবে না ফুল গো—মোদের ঝরবে না ফুল।'' ৩৯ কিংবা, ''ভালোমানুষ নই রে

মোরা / ভালোমানুষ নই। / গুণের মধ্যে ওই আমাদের / গুণের মধ্যে ওই। / দেশে দেশে নিন্দে রটে, / পদে পদে বিপদ ঘটে, / পুঁথির কথা কই নে মোরা / উলটো কথা কই।''৪০

নৌকাডুবি উপন্যাসে বালক উমেশ-এর মধ্যেও ঘটেছে নির্ভীকতার প্রকাশ। ঝড়ের রাতে স্টীমারে কমলা যখন তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছে, তখন তার প্রত্যুত্তর : 'মা, আমি কাহাকেও ভয় করি না।' *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে অমূল্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে যেমন দ্বিধাহীন নির্ভীক, তেমনি নিজের ওপর অস্বাভাবিকরকম আস্থাশীলও। অমূল্যর উক্তি : ''তুমি যা বলবে আমি প্রাণ দিয়ে করব দিদি।'' অন্যত্র, ''রানীদিদি তুমি কিছু ভেবো না। আমি চললুম, কিছুতেই নিস্ফল হয়ে ফিরব না।''৪১ নির্দ্বিধায় প্রাণোৎসর্গের কথা *রক্তকরবী* নাটকে কিশোরও উচ্চারণ করে: ''একদিন তোর জন্যে প্রাণ দেব নন্দিনী···।''

রবীন্দ্রকথাসাহিত্যে বিশেষ দার্শনিক-অনুভবের প্রতীক এসব বালকের উর্ধ্বতম বয়সসীমা আঠারো। *ঘরে-বাইরে*-র অমূল্যর বয়স আঠারো, *আপদ* গল্পের নীলকান্তের বয়স সতেরো / আঠারো, *অতিথি* গল্পের তারাপদর বয়স পনেরো/ ষোল, *ছুটি* গল্পের ফটিকের বয়স তের/চৌদ্দ। এছাড়া *চোখের বালি*-র বসন্তের বয়স আট, *যোগাযোগ*-এর হাবলুর বয়স সাত। *দিদি* গল্পে নীলমণি দুই থেকে ছয় বছর বয়স পর্যন্ত এবং *রাজর্ষি* উপন্যাসে ধ্রুব দুই থেকে এগার বছর বয়স পর্যন্ত বর্তমান। বয়সের উল্লেখ নেই বলাই, *ডাকঘর*-এর অমল, *রক্তকরবী*-র কিশোর, *বিসর্জন*-এর ধ্রুব এবং *নৌকাডুবি*-র উমেশের। বালক-বয়সের সীমা সম্পর্কিত রবীন্দ্রচিন্তার প্রকাশ তার *পূর্ণ* (১৩১৭) প্রবন্ধে লক্ষণীয়:

···শিশুর জীবনে ঈশ্বর তার জগতের পুঁথিতে যে-সমস্ত রঙচঙ-করা ক খয়ের ছবির পাতা খুলে রাখেন, তাই বার বার উলটে-পালটে তার আর দিনরাত্রির জ্ঞান থাকে না। কোনো অর্থ, কোনো ব্যাখ্যা, কোনো বিজ্ঞান, কোনো তত্ত্বজ্ঞান তার দরকারই হয় না — সে ছবি দেখেই খুশি হয়ে থাকে; মনে করে, এই ছবি দেখাই জীবনের চরম সার্থকতা।

তার পরে আঠারো বৎসর পেরিয়ে যেদিন উনিশে পা দিলুম, সেদিন খেলনা লজেঞ্জুস ও রূপকথা একেবারে তুচ্ছ হয়ে গেল। সেদিন যে ভাবরাজ্যের সিংহদ্বারের সমুখে এসে দাঁড়ালুম, সে একেবারে সোনার আভায় ঝল্‌মল্ করছে এবং ভিতর থেকে যে একটি নহবতের আওয়াজ আসছে, তাতে প্রাণ উদাস করে দিচ্ছে।···৪২

এসব বালকের আরেকটি বৈশিষ্ট্য : তারা হয় পিতা কিংবা মাতা অথবা উভয়কে হারিয়েছে। এরমধ্যে একমাত্র হাবলুরই পিতা মাতা বর্তমান। *রাজর্ষি*-র ধ্রুব, *দিদি* গল্পের নীলমণি ও *ডাকঘর*-এর অমল পিতৃমাতৃহীন। *ছুটি* গল্পের ফটিক, *অতিথি* গল্পের তারাপদ ও *ঘরে বাইরে*-র অমূল্য পিতৃহীন। অন্যদিকে *আপদ* গল্পের

নীলকান্ত, বলাই, *চোখের বালি*-র বসন্ত ও *নৌকাডুবি*-র উমেশ মাতৃহীন। তবে *বিসর্জন*-এর ধ্রুব ও *রক্তকরবী*-র কিশোরের পিতামাতার কথা উল্লেখ নেই।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বালক নির্মলতা, শুদ্ধতা ও প্রশান্তির প্রতীক। কথাসাহিত্য শিল্পীর কাছ থেকে যে সমগ্রতাশুদ্ধ মানবজীবন-রূপায়ণ দাবি করে, তার-ই আন্তর্গরজে রবীন্দ্রনাথের শিল্পিসত্তায় 'বালক' ইমেজটি অখণ্ড মনোযোগ লাভ করেছে। কী গভীর অনুসন্ধিৎসা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ মানবমনস্তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করেছেন, বালক-বিষয়ক রবীন্দ্রপ্রত্যয়েই তার সাক্ষ্য স্পষ্ট। কল্পনায় মহাকাশচারী, দুশ্চিন্তাহীন, অক্লান্ত কৌতূহলী — বালকমাত্রের এই দেশকালনিরপেক্ষ বৈশিষ্ট্যটি রবীন্দ্রনাথের মতো বাংলা সাহিত্যের আর কোনো শিল্পীর রচনায় এমন দার্শনিক-উপলব্ধির বাহন হয় নি। আত্মোপলব্ধি ও আত্ম-অতিক্রমণের যে-নিরন্তর সাধনা মানবজীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত, বালকের মধ্যে বারবার তারই স্ফুরণ লক্ষ করা যায়। কাল-পরিক্রমায় বস্তু ও প্রাণিজগতের যে বিকাশ ও পরিশুদ্ধি ঘটছে সে-ই বিজ্ঞানসত্যটি মানবজীবনের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। পরিশুদ্ধির এই চিহ্নই বালকবৈশিষ্ট্যে চিরদিন উজ্জ্বলভাবে ধরা পড়েছে। বালক-সম্পর্কিত এই বিজ্ঞানসত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দর্শনশুদ্ধ শিল্পিসত্তা যুক্ত হয়ে তার কথাসাহিত্যকে সুষমামণ্ডিত করেছে।

তথ্যনির্দেশ

১ *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ), বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭, অষ্টম খণ্ড, ফাল্গুন ১৩৯৫, পৃ. ৫৪৬

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৪

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৯

৪ প্রাগুক্ত

৫ *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৪০৭

৬ প্রাগুক্ত, ষষ্ঠ খণ্ড, বৈশাখ ১৩৯৫, পৃ. ৩৮৬

৭ *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, তৃতীয় খণ্ড, চৈত্র ১৩৯৩, পৃ. ৭৫০

৮ *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৪৪

৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৭-১৮

১০ প্রাগুক্ত, পৃ ৭৯৭

১১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯৬

১২ *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৬৪১

১৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৯

১৪ *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪১০
১৫ প্রাগুক্ত, চতুর্থ খণ্ড, ভাদ্র ১৩৯৪, পৃ. ৫৮১
১৬ *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৭৫৬
১৭ প্রাগুক্ত, নবম খণ্ড, পৃ. ৩৪৮
১৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬-৪৭
১৯ *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পঞ্চম খণ্ড, পৌষ ১৩৯৪, পৃ. ৩৫৭
২০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৯
২১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৭
২২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৯
২৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯১
২৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯২
২৫ *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, অগ্রহায়ণ ১৩৯৩, পৃ. ৪৬৩
২৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৫
২৭ রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রাগুক্ত, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৫৫
২৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬
২৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২
৩০ *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, চতুর্থ খণ্ড পৃ. ৫৫৫
৩১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৯
৩২ প্রাগুক্ত
৩৩ *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, শ্রাবণ ১৩৯৩, পৃ. ৫৭৯
৩৪ প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৬০
৩৫ *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৫৩০
৩৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৭
৩৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৯
৩৮ *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৯৩
৩৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৪
৪০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৩
৪১ *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৫৬৭
৪২ প্রাগুক্ত, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৫৬৮